Bangladesh Journal of Political Economy

© 2012 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 28, No. 2, December 2012, pp. 011-016
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

শিক্ষা ঃ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উৎকৃষ্ট হাতিয়ার[১]

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন*

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। কারণ এরা ভাল মন্দ বুঝতে পারার ক্ষমতা রাখে। লজ্জা নিবারণের জন্য কাপড় পরিধান করে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় বিধান ও রীতিনীতিকে মান্য করে। এ সকল যুক্তিগ্রাহ্য ও শোভন কর্মকান্ড মানুষের মনে অবস্থানকারী যৌক্তিকতা ও বুদ্ধিমত্তারই বহিঃপ্রকাশ। তবে মানুষের সুকুমার প্রবৃত্তি ও ন্যায়-অন্যায় ভেদাভেদের ক্ষমতা হয়ত সুপ্তই থেকে যায় যদি না শিক্ষার মাধ্যমে এ সকল কল্যাণ-প্রসূত গুণাবলী জাগ্রত, মুকুলিত ও বিকশিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভূমা'কে অর্থাৎ নিজের অস্তিত্ব ও পারিপার্শ্বিকতাকে জানার যে তাগাদা দিয়েছেন একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই তা সম্পন্ন করা যায়। তবে শিক্ষা কেবল পুথিগত বিদ্যায় সীমাবদ্ধ এ কথা বলা যাবে না। অন্তর্নিহিত শক্তি দিয়ে আর হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে মানব সন্তান অবশ্যই জানা, বুঝা ও উপলব্ধি করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে কোন আনুষ্ঠানিক বিদ্যায়তনে না গিয়েও। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে শিক্ষা বিষয়ে কবি শ্রী সুনির্মল বসুর চমৎকার একটি সংজ্ঞার কথা

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাইরে
কর্মী হওয়ার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাইরে
পাহাড় শিখায় তাহার সমান
হই যেন ভাই মৌন মহান
খোলা মাঠের উপদেশে
দিল খোলা হই তাইরে

পঞ্চম শ্রেণীতে ১৯৫২ সনে পড়া এই চমৎকার কবিতাটির শেষ চরণ হল:

বিশ্বজুড়ে পাঠশালা মোর
সবার আমি ছাত্র।

তবে কিনা নশ্বর পৃথিবীতে বিপুল চাহিদা ও তা মিটাতে সম্পদের মহা অপ্রতুলতার নিরিখে এগিয়ে যাওয়ার যে প্রতিযোগিতা তাতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয়টিও অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে

১. ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখের ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৮তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে অধ্যাপক ড. মোজাফ্ফর আহমদ স্মারক বক্তৃতা হিসাবে উপস্থাপিত।

* সাবেক গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক; চেয়ারম্যান, ট্রাস্টি বোর্ড, ইষ্ট-ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই লালিত কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণাকে পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করে "দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর" জন্যই শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করা প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থেকে টেকসই মানব সম্পদ উন্নয়ন

ছয় সাত দশক আগেও জাগতিক অগ্রগতি বলতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকেই বুঝানো হত। ইহার পরিমাপ করা হত গ্রোস ডমেস্টিক প্রডাক্ট জিডিপি (GDP) এবং ইহার বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি দিয়ে। দেখা গেল এই নিছক আর্থিক মানদন্ডের অগ্রগতির ধারাটি শুধু যে সাম্বৎসরিক বা ক্ষণস্থায়ী তাই নয়, ইহা অর্থাৎ বার্ষিক সামষ্টিক আয় বৃদ্ধি, বিশেষ করে উন্নয়নশীল প্রাথমিক শিল্প (কৃষি) প্রধান দেশসমূহে আবহাওয়া পরিবর্তনের অনিশ্চয়তায় টালমাটাল হয়ে যেতে পারে। আর এটিও সত্য যে বার্ষিক সামষ্টিক আয় যদি অন্ততঃ তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্য মেয়াদে উঠা নামা না করে স্থিতিশীল থাকে তবেই এর ভিত্তিতে জনসাধারণের জীবনযাত্রা তথা জনকল্যাণের জন্য অপরিহার্য সামাজিক অগ্রগতি শুরু হতে পারে। এতেই ইকনোমিক গ্রোথ থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা ডেভেলপমেন্টে রূপান্তর ঘটে। শুরু হয় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা আহরণের মধ্য দিয়ে কুসংস্কারসহ অন্যান্য পেছনে টানা সামাজিক ব্যাধির আমূল পরিবর্তন। মধ্যমেয়াদে জিডিপির ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফলে মাথাপিছু আয়ের নিশ্চিত বা প্রেডিক্টেবল সম্প্রসারণ ঘটে। শুরু হয় সেকেন্ডারী সেক্টর তথা ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মকান্ড যার মাধ্যমে প্রাইমারি খাতের উৎপাদনকে আধুনিক শিল্প খাতের প্রক্রিয়াজাতের অধীনে আনা হয়। আর্থার লুইস এর দ্বিখাত ভিত্তিক অগ্রগতির এই তত্ত্বে জিডিপিতে কাঠামোগত পরিবর্তন শুরু হয় অর্থাৎ ইহাতে কৃষি / প্রাথমিক খাতের অবদান হ্রাস পেয়ে সেকেন্ডারী আধুনিক শিল্প খাতের অবদান আপেক্ষিকভাবে বৃদ্ধি পায়। কুসংস্কারের অন্ধকারের ছায়াঢাকা অত্যন্ত অল্প ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশংকায় অনিশ্চিত মাথাপিছু প্রকৃত মজুরী (রিয়েল ওয়েজ) পেছনে ফেলে কৃষি খাতের উদ্বৃত্ত খন্ডকালীন বেকার (ডিজগাইজড আনএমপ্লয়মেন্ট আক্রান্ত) মানুষেরা আধুনিক শিল্পের বেশী ও নিশ্চিত মজুরীর সন্ধানে শহরে পাড়ি জমায়। এতে একদিকে যেমন শিল্প খাতে কর্মরতগণের আয় মজুরী বৃদ্ধি পায় তেমনি কৃষি খাতের লোকসংখ্যা কমে গিয়ে সেখানেও প্রকৃত মজুরী বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে বৃহত্তর আয়ের কল্যাণে পরিবারের সন্তানদের স্কুলে পাঠানো সম্ভব হয়। বৃদ্ধি পায় চিকিৎসা সেবা গ্রহণসহ বিভিন্ন সেবাখাতের উপকার গ্রহণ। জীবনযাত্রার মানে দেখা দেয় উর্ধগতি। সম্পূর্ণ হয় ইকনমিক গ্রোথ থেকে ইকনমিক ডেভেলপমেন্টের সোপানে আরোহণ।

ডেভেলপমেন্ট থেকে টেকসই বা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট

ইহা জানা কথা যে গ্রোথ বা ডেভেলপমেন্ট এর সূচনা হয় আয় থেকে ভোগের খরচ মিটিয়ে সঞ্চয় করে ইহার বিনিয়োগ মাধ্যমে। অর্থাৎ সাম্বৎসরিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি থেকেই কাঙ্খিত সামষ্টিক আয় অথবা জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ঘটে। ঐ বিনিয়োগ বা আয় বৃদ্ধি করা সম্পদ নিয়োজন বহুমাত্রিকতায় (মাল্টিপ্লায়ার এফেক্ট) উপকৃত হয়। কিন্তু সম্পদ যেহেতু সসীম এবং অনেক ক্ষেত্রে সমাপ্তি সংকট প্রবণ (একজষ্টিবল) যেমন খনিজ সম্পদ, প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল তাই ইহার বিনিয়োজন তথা ব্যবহারের হার এর উপর যেমন বার্ষিক সামষ্টিক আয় বৃদ্ধির (এবং ইহা থেকে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি) হার নির্ভর করে তেমনি ঐ সসীম অথচ ক্ষেত্র বিশেষে সমাপ্তি সংকট প্রবণ সম্পদের সাময়িক নিয়োজন-এর বিষয়টিও তাৎপর্যপূর্ণ। যদি বর্তমান প্রজন্মের দ্রুততর মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি তথা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির গতি খুব বেশী বাড়ানো হয় তাহলে সসীম ও সমাপ্তি সংকট প্রবণ

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : শিক্ষা ঃ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উৎকৃষ্ট হাতিয়ার ১৩

সম্পদ দ্রুত গতিতে ফুরিয়ে যাবে। এর ফলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিয়োগান্তক কালো ছায়া নেমে আসবে। সে কারণেই সসীম ও সমাপ্তি সংকট প্রবণ সম্পদের বর্তমান বিয়োজন হার এমনভাবে করতে হবে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রবৃদ্ধির পথ খোলা রাখা সম্পদাংশ হয় সংরক্ষণ করা হয় অথবা ইহার পুনঃসৃষ্টির সজ্ঞান প্রচেষ্টা করা হয়। এই ভাবে বর্তমানের আয় প্রবৃদ্ধি তথা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের গতি বাড়ানো যদি এমন ভাবে করা হয় যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সমৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট সম্পদ সংরক্ষণ করা হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে সম্পদের পুনঃসৃষ্টি করা হয় তবেই টেকসই উন্নয়ন বা সাস্টেইনেব্‌ল উন্নয়নের ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পর্যায়ে প্রকৃতি মায়ের সযতন রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। গাছ কাটলে আরও গাছ লাগানো হয় অধিকতর সংখ্যায়। মাছ ধরলে বেশী বেশী মাছ উৎপাদনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান দুষণ করে প্রকৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করলে প্রতিবিধান করা হয়। নবায়নযোগ্য জ্বালানী তথা সৌর বিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস জ্বালানী, বায়ুচালিত বিদ্যুৎ ইত্যাদির সৃষ্টি ও ব্যবহার ও সাস্টেইনেব্‌ল ডেভেলপমেন্টের একটি মাহাত্ম্যপূর্ণ বৈশিষ্ট। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি মাইলফলক অগ্রগতি হিসাবে গণ্য।

সাস্টেইনেব্‌ল ডেভেলপমেন্ট থেকে টেকসই মানব উন্নয়ন

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও ফলশ্রুতিক সামাজিক অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ সংযোজন টেকসই মানব উন্নয়ন যে পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ মানব সম্পদকে উন্নয়নের পথে মূলধারায় কেন্দ্রীয় এবং মুখ্য শক্তি হিসাবে বসানো হয়। এখানে যন্ত্রপাতি অট্টালিকাসহ সকল জাগতিক উন্নতিকে মানুষের সার্বিক অগ্রগতির কেবল মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই পর্যায়ে বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিত মানবাংশ (ডিজএডভেন্টেইজড্) যথা প্রতিবন্ধিতার অসুবিধায় আক্রান্তগণ, আর্টিস্টিক জনগোষ্ঠি, হতদরিদ্র, অশিক্ষিত, দেশের দূরতম অঞ্চলের সকল নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত মানুষজনের প্রতি সবিশেষ নজর দেওয়া হয়। সামাজিক হস্তান্তর যথা নগদ অর্থ প্রদান, বিনামূল্যে ক্ষণকালীন খাদ্য বিতরণ, শীত বস্ত্র বিতরণ অর্থাৎ হাল আমলের সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী অস্থায়ীভাবে উহাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করলেও কবিগুরুর ভাষায়

"এই সব মূঢ় ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা
এই সব ভগ্ন শুষ্ক বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

তে যে অমোঘ বাণীর নির্দেশনানামা মানবকুলের উপর জারী করা হয়েছে তার সঠিক সম্পূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী রূপায়নের জন্য বিপুল, বিস্তৃত, গভীর ও পরিমিত বিনিয়োগের ধারা সৃষ্টি করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মানুষরাই তাদের উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প ধারণার উন্মেষ, প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও ফলভোগের দাবীদার হবেন। তখন উন্নয়ন হবে সঠিকভাবে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত, লুপ্ত হবে মধ্যস্বত্তভোগীদের কেড়ে নেয়া উৎপাদনের বড় অংশ এবং বৃদ্ধি পাবে টেকসই মানব উন্নয়নের ধারা।

শিক্ষাই টেকসই মানব উন্নয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম

এখানে স্মর্তব্য যে মহাজ্ঞানী মহাজনগণ বলে গেছেন যে শিক্ষার ফলেই মানুষের মাঝে লুকিয়ে থাকা সকল গুণাবলী ও প্রতিভার পুণর্জন্ম, বিকাশ ও উৎকর্ষতা লাভ করে। উপযুক্ত শিক্ষাই মানুষকে উন্নয়নের পথে চৌকস নেতৃত্বের আসনে বসার মত ক্ষমতা দিতে পারে। শিক্ষার মাধ্যমে চিন্তা ও চেতনার দিগন্ত প্রসারিত ও উদ্ভাসিত হয় এবং "ইয়া সীন ওয়াল কোরান এল হাকিম" আয়াতে এবং অন্য সকল ধর্মের সমতুল্য বাণী তে মহান সৃষ্টিকর্তা বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক জ্ঞান ভান্ডার আহরণের যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করেছেন তাতেই মানুষের ক্ষমতায়নের বা অসুবিধাগ্রস্ত সকল মানুষের এমপাওয়ারমেন্ট বা ক্ষমতায়নের

শক্তি নিহিত রয়েছে। আমার কাছে ক্ষমতায়নের সংজ্ঞা অতি সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত ঃ একজন মানুষকে এমন একটি বৃত্তিমূলক বা পেশাজীবি শিক্ষায় শিক্ষিত অথবা কমপক্ষে প্রশিক্ষিত করে গড়তে হবে যাতে তিনি সেই বৃত্তিমূলক বা পেশাজীবি জ্ঞানে ক্ষমতায়িত হয়ে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ইহার বরাতে ভাল কর্মসংস্থান পেতে পারেন। কর্মসংস্থানই হচ্ছে আয় রোজগার ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সবচেয়ে শক্তিধর চাবিকাঠি। এ প্রক্রিয়ায় দারিদ্র নিরসনের দুরূহ কাজটি উন্নয়নের পথ চলাতেই অন্তর্নিহিত থাকে কারণ আয় রোজগারই দারিদ্রকে দূর করে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পথ পরিক্রমা

দেশের সামষ্টিক আয়ের প্রবৃদ্ধি এবং ইহার সামাজিক ট্রান্সফরমেশনে সামগ্রিকভাবে সফলতার দাবী করা যেতেই পারে। তবে গত ছ'দশকে এশিয়ার অন্যান্য দেশ সিংগাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও মালদীভস এর তুলনায় প্রবৃদ্ধির হার ও মাথাপিছু আয়ের হিসাবে বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে। ভারত, পাকিস্তান ও ভিয়েৎনামের সাথে অনেক বছর পাল্লা দিতে পারলেও এখন মাথাপিছু আয়ের নিরিখে পিছেয়ে পড়ছে দেশ। আবার অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা ১৯৭২ সনের মাথাপিছু আয় ১৭০ মার্কিন ডলারের বিপরীতে বর্তমানে ৮০০ মার্কিন ডলারের উপরে ইতিবাচকই বটে। সামষ্টিক আয়ের কাঠামোগত পরিবর্তনে ১৯৭২ সনে প্রাথমিক (কৃষি) খাতের অবদান ছিল ৫৩ ভাগ আর বর্তমানে খাদ্য উৎপাদনে দৃষ্টিনন্দন সাফল্য (১৯৭২ সনে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল এক কোটি টন, বর্তমানে সাড়ে তিন কোটি টন) সত্ত্বেও এ খাতের অবদান শতকরা ২০ ভাগেরও কম। এই ইতিবাচক ধারায় সুফলের সিংহভাগই অবশ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী শিল্প খাতে প্রবাহিত না হয়ে সেবা খাতে চলে গেছে যার অবদান শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী হয়ে গেছে। সেবা খাতে মুনাফা বেশী কিন্তু কর্মসংস্থান প্রবণতা কম আর সে কারণেই বেকারত্ব দূর করার সংগ্রামের সাফল্য কিছুটা হলেও ম্লান হয়েছে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সামাজিক ট্রান্সফরমেশনে কতিপয় চমৎকার ইতিবাচক ফল লাভ ঘটেছে। শিক্ষার হার (৬৫%), গড় আয়ু (৬৬ বছর), শিশু মৃত্যুর হার (হাজারে ৩৯), নারীর ক্ষমতায়ন ও মাতৃ মৃত্যুর হার সহ অনেক ক্ষেত্রের সাফল্য বিশেষ করে জাতিসংঘের মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের বাস্তবায়নে বেশ কিছু সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবেও প্রশংসিত হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের স্বীকৃতি পদক পেয়েছেন। নোবেল বিজয়ী বিশ্বশীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বাংলাদেশের সামাজিক খাতসমূহের অগ্রগতিকে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা বলে অকুণ্ঠচিত্ত প্রশংসা করেছেন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির মানব সম্পদ উন্নয়ন ইন্ডেক্স (এইচডিআই) আবিষ্কারের অন্যতম রূপকার পাকিস্তানের মরহুম ডঃ মাহবুবুল হক বাংলাদেশের সামাজিক অগ্রগতি বিশেষ করে মানব সম্পদ উন্নয়নে ইহার সাফল্যকে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। দারিদ্র নিরসনের সাম্প্রতিক সাফল্য সত্ত্বেও শতকরা ৩১ ভাগ মানুষের দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থান করা এবং বিভ্রান্তিকর আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) গলদপূর্ণ সংজ্ঞার কারণে বেকারত্বের হার কম দেখানো হলেও সমস্যাটি বেশ প্রকট ও জটিল। টেকসই মানব উন্নয়নের পথ চলায় তাই এখনো অনেক দূর যেতে হবে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় কাঙ্খিত অগ্রগতি ও ক্ষমতার ফলপ্রসু বিকেন্দ্রীকরণের অভাবে ও সঠিকভাবে সম্পদের অপচয় ও ন্যূনতম পর্যায়ে রেখে টেকসই মানব উন্নয়নের পালে আরও জোরদার বাতাস লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষা খাতে প্রসার ও পরিমাণগত সাফল্য সত্ত্বেও গুণগত মানে পিছিয়ে থেকে অসুবিধার সৃষ্টি করছে। প্রাথমিক শিক্ষায় শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করে, ঝরে পড়ার হার উল্লেখযোগ্য হ্রাস টেনে ধরে এবং মেয়ে শিশুদের

ভর্তির ক্ষেত্রে সাফল্য উল্লেখযোগ্য হলেও বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের উচ্চ ঝরে পড়ার হার বিষয়ে আরও নজর দেয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের সবচেয়ে অন্ধকারময় দিক হলো সেকেন্ডারী পর্যায়ে অগ্রগতির অভাব। অথচ প্রাইমারী ও সেকেন্ডারীতে বিনামূল্যে সময়মত বই বিতরণ, ৫ম ও ৮ম শ্রেণী সমাপনী পরীক্ষা জাতীয়করণ সম্পন্ন করা এবং প্রায় ১০ বছরের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে নকলবাজী বন্ধ করা সত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রের অগ্রগতি বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষার প্রসারে এখনো তেমন গতি আসেনি।

সমসাময়িক বিশ্বের অগ্রগতির নিরিখে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নচিত্র

১৯৯১ সনের তীব্র আন্দোলন সংগ্রামের সাফল্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের পর থেকে বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার কোন বছরেই শতকরা পাঁচ ভাগের নীচে নামেনি। কোন কোন বছর ইহা শতকরা সাত ভাগের কাছে পৌঁছে গেছে। তা সত্ত্বেও পূর্বে উল্লেখ করা কয়েকটি দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি পিছিয়ে রয়েছে। ঐসব দেশের দ্রুতগতি উন্নয়নের কারণ বহুবিধ যেমন সুশাসন , শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন, স্থিতিশীলতা, শিক্ষার হার বেশী হলেও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞগণ শিক্ষাকেই প্রধান হাতিয়ার হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। যে সকল দেশে শিক্ষার হার যত বেশী সে সকল দেশে সামষ্টিক আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধি তত বেশী। তার চেয়েও বড় কথা পাঠ্যক্রমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার পরিমাণ যত বেশি বার্ষিক জিডিপি বৃদ্ধির হারও তত বেশি। গত এক দেড় দশক ধরে বিশ্বব্যাংক সঠিকভাবেই উচ্চতর অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গড়ে প্রবৃদ্ধির হারে গতি আনার উপর জোর দিয়েছে।

তবে সর্বশেষ এবং বাংলাদেশের জন্য শুভ সংবাদ বহনকারী বার্তা হল যাকে বলে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডস এর সুবিধা। এ তত্ত্বের মর্মার্থ হল এই যে, জনসম্পদই হল উন্নয়নের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। গোল্ডম্যান স্যাকস বাংলাদেশসহ যে ১১টি দেশ বর্তমান শতাব্দীর উন্নয়ন কেন্দ্র বলে চিহ্নিত করেছেন তার সবগুলোই জনবহুল। আবার ব্রিকভুক্ত (ব্রাজিল, ইন্ডিয়া, গণচীন ও রাশিয়া) দেশগুলোও জনসংখ্যার দিক থেকে বিশাল বিশাল।

এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তুলনামুলক সুবিধা এবং টেকসই মানব উন্নয়নে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে চলার পথ কঠিন বলেই সজ্ঞান ও সাহসী পদক্ষেপ নেয়ার কোন বিকল্প নেই। চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠিকে বোঝা হিসাবে রেখে না দিয়ে ইহাকে ব্রিকস ও অন্যান্য দ্রুতগামী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির রেলে আসীন দেশগুলোর মত জনসম্পদ তথা জনশক্তিকে রূপান্তর করা। এর জন্য অবশ্য সজ্ঞান পরিকল্পনা, প্রোগ্রাম বা কর্মসূচী প্রণয়ন ও সমন্বিত প্রকল্পমালা তৈরী, অর্থায়ন ও সুষ্ঠু - স্বচ্ছ কার্যকর বাস্তবায়ন জরুরী। সেই সাথে মনে রাখা ভাল যে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ কেবল একটি সাময়িক সহায়ক শক্তি হতে পারে। টেকসই মানব উন্নয়নে কল্যাণ রাষ্ট্রের সুদৃঢ় ও সুদূর প্রসারী পদক্ষেপের কোন বিকল্প নেই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে ১৬ কোটি মানুষের একশ সাড়ে একচল্লিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের দেশে পরিকল্পিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি যেন অচিরেই রিপ্লেসমেন্ট পর্যায়ে নেমে আসে ও স্থিতি লাভ করে সেদিকে সতর্ক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সমীচীন হবে।

টেকসই মানব উন্নয়নে আশু করণীয়

রাষ্ট্রীয় বাজেটই হউক অথবা পারিবারিক বাজেট, সকল খাতের ব্যয়ই খরচ, ব্যতিক্রম শুধু শিক্ষাখাত। এ ক্ষেত্রে সম্পদের যে কোন ব্যবহারই বিনিয়োগ হিসাবে গণ্য। কারণ শিক্ষার খরচ হিউম্যান ক্যাপিটাল বা

মানবসম্পদ মূলধন সৃষ্টি করে যা সুশাসন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিনিয়োগের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা ক্যাপিটাল ঃ আউটপুট রেশিও হ্রাস করা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী কার্যকর ও কল্যাণপ্রসু উপকারের ধারা সৃষ্টি করে। শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ একটি দ্রুতগামী অগ্রসরতা প্রত্যাশি বিকাশমান দেশের জন্য ইহার মোট সামষ্টিক আয়, জিডিপির শতকরা অন্ততঃ ছয়ভাগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশে এর অনুপাত জিডিপির মাত্র ২.২ ভাগ। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। মরহুম প্রফেসর মোজাফর আহমদসহ অনেক নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক ও অর্থনীতিবিদ শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ অন্যান্য এশীয় দেশের অনুরূপে অন্তত শতকরা পাঁচ ভাগে বৃদ্ধি করার দাবী জানিয়ে আসছেন। সাম্প্রতিক একটি গবেষণা জরিপে দেখা গেছে যে ইন্টারনেট ব্যবহারে ইন্টেন্সিটির পরিমাপে ৬১টি দেশের মধ্যে অত্যন্ত নিম্ন ৫৫তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার ২০১২ সনে বাংলাদেশে বছরে ২৬৫ কিলোওয়াট আওয়ার যা ২০১০ সালেই ভারতে ছিল ৬৬৫ কিলোয়াট আওয়ার আর পাকিস্তানে ৪০৮ ও শ্রীলংকায় ৩২৫। সুতরাং টানাটানির বাজেট ও অবকাঠামোর অপ্রতুলতা টেকসই মানব উন্নয়নে বড় বাধা। অবকাঠামো নির্মাণে দেশ ও রাষ্ট্রের নিজস্ব অগ্রাধিকার ও গতির একটা সীমা থাকবে বটে। কিন্তু শিক্ষাখাতের বাজেট বরাদ্দের অপ্রতুলতা কাটানোর জন্য প্রতি বছর জিডিপির ০.৫ ভাগ বরাদ্দ করে পাঁচ বছরে মোট বরাদ্দ জিডিপির শতকরা ৫ ভাগে উন্নীত করার বিষয়তে সরকার সহৃদয় বিবেচনা দিতে পারেন। আরও গুরুত্বপুর্ণ হতে পারে শিক্ষা খাতে অর্থপূর্ণ প্রাইভট - পাবলিক পার্টিসিপেশন।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইহার বড় জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হলে একটি জনশক্তি সার্ভে করা প্রয়োজন। পেশা ও বৃত্তিভিত্তিক জনসম্পদের প্রয়োজনের বিপরীতে বর্তমান হাল নাগাদ যোগানের ম্যাপিং করা হলেই কোন্ খাত, পেশা ও বৃত্তিতে কত অধিক জনশক্তির প্রয়োজন তা নির্দ্ধারিত হয়ে যাবে। সে অনুসারে এবং চাকুরী প্রদানকারী কর্পোরেট খাতের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে ইহাকে আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক এবং দেশে বিদেশে জনশক্তি সেবার চাহিদা নিরিখে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। মাধ্যমিক পর্যন্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং উচ্চশিক্ষায় প্রযুক্তির সমাহার ঘটিয়ে শিক্ষিতজনদের আরও প্রাসংগিক এবং চাহিদামুখী করা সমীচিন হবে।

সবচেয়ে বড় কথা, সরকার সম্প্রতিকালে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দারিদ্র নিরসনে অগ্রগতির পুরানো মডেল বাদ দিয়ে পরিকল্পিত পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানমূলক উন্নয়নের যে নীতি কৌশল অবলম্বন করেছে তা সর্বশক্তি নিয়োগ করে মানব সম্পদ সৃষ্টি তথা বড় জনসংখ্যাকে শিক্ষিত করে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে কৃষি নির্ভর স্বল্প পুঁজি ও ন্যূনতম সময়ে উৎপাদনে সক্ষম অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মধ্যম সাইজের প্রকল্প লহরি সৃষ্টি করে নবায়নযোগ্য সৌর শক্তিতে তা চালানোর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারলে বহুবিধ অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান, আয়রোজগার বৃদ্ধি ও অসুবিধাগ্রস্তদের ক্ষমতায়ন মাধ্যমে দারিদ্র দূর হবে এবং টেকসই মানব উন্নয়ন ঘটবে। এ প্রক্রিয়াতে হাতে কলমে বিশেষ করে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ঘটবে বৈপ্লবিক অগ্রগতি। দূর হবে হতাশা ও তমসার কালরাত্রি। জাতীয় কবি, বিদ্রোহী কবি, সৌন্দর্যের উপাসক, প্রেমের সাধক, অসাম্প্রদায়িকতার মূর্তপ্রতীক ও নারী পুরুষের সাম্যের দৃঢ়তম প্রবক্তা কাজী নজরুলের ভাষায়,

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত।